ঋত, সত্য ও ধর্ম

ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন স্থানে ঋতকে সত্য ও ধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, ঋত, সত্য ও ধর্ম এই ধারণাগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কিভাবে সংবদ্ধ। ঋগ্‌বেদে সত্যকে বৃহৎ এবং ঋতকে উগ্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার ঋতকে অনৃতের বিপরীত বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। অনৃত হ'ল অসত্য বা মিথ্যা। এইদিক থেকে 'সত্য' এবং 'ঋত' হ'ল পর্যায়শব্দ। সত্য অসত্যের বিপরীত, ঋত অনৃতের বিপরীত। 'অনৃত' ও 'অসত্য' যদি পর্যায়শব্দ হয় তা হলে স্বাভাবিকভাবেই 'ঋত' ও 'সত্য'কেও পর্যায় শব্দ বলা যায়। আবার ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে সত্য, ঋত, অনৃত এসবকিছুকে নিয়েই ধর্ম (সত্যানৃত মিথুনীকৃত্য)। সত্য, ঋত, দীক্ষা, তপঃ, অনৃত সবকিছুই ধর্মে অন্তর্ভুক্ত।

কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়সংহিতায় বলা হয়েছে—"ঋতম্ চ সত্যম্ চ বদত" । এ থেকে ঋত ও সত্য যে দুটি ভিন্ন ধারণা তা স্পষ্টতঃই বোঝা যায়। টীকাকার ভট্টভাস্কর উভয়ের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, "বাচিসত্যম্ প্রতিষ্ঠতম্ মনেসঃ সংকল্প ঋতম্।" অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয় তা হল সত্য। অপরদিকে এ সত্যই যখন মানস বিষয়রূপে অনুচ্চারিত থাকে তখন তাকে বলা হয় ঋত। সায়ন অনুরূপভাবেই ঋত ও সত্যের পার্থক্য করেছেন। কিন্তু এই পার্থক্য বাহ্য। উচ্চারিত সত্য এবং মানসসত্য বস্তুতঃ একই সত্য। বস্তুতঃপক্ষে ঋতই সত্য, ঋতই ব্রত, ঋতই শ্রদ্ধা, ঋতই ধর্ম, ঋতই অমৃত। ঋতব্রতীর সকল ব্রতই সার্থক হয়। তিনি শ্রদ্ধার পাত্র হন এবং অমৃতত্ব লাভ করেন। আবার ঋত, সত্য, যজ্ঞ, ব্রহ্ম এসবই ধর্ম, এগুলি ধর্মেরই নানা প্রকারভেদ। সর্বসমন্বিত ধর্মই পৃথিবীর ধারক (পৃথিবীং ধর্মনা ধৃতম্)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বৈদিক ধ্যান-ধারণায় ঋত হ'ল বিশ্বের

মূল সূত্র। সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রে এই একটি ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা। জীব, জগৎ, প্রকৃতি ও সমাজ সম্বন্ধেরই ঘটনা-প্রবাহ ক্ষণের ধারণাকেই প্রতিফলিত করে। যোগদর্শনটী চিন্তাধারায় ক্ষণ মনের সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়েছে। বস্তুত দর্শনিক চিন্তার স্তরে বিভিন্ন প্রস্থানে পৃষ্টীত অনন্তমনীয় সর্বাদল ক্ষণের ধারণাকেই প্রতিফলন বলে মনে হয়।

কর্মবাদ ক্ষণ যোগেই নিয়ন্ত্রণ

ঋণ*

দৈনিক স্নান-খাওয়ার মতো ঋণদানও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হ'ল ঋণের ধারণা। 'ঋণ' বলতে বোঝায় ঋণদাতার কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ। যে ঋণদাতার কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করে তাকে বলা হয় ঋণমর্ণ। ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে যে গ্রহণ করে তাকে বলা হয় উত্তমর্ণ। উত্তমর্ণের কাছ থেকে ঋণমর্ণ যা গ্রহণ করে তার সমমূল্যের বা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় উত্তমর্ণকে ফেরত দেবার সাথে ঋণব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। দৈনন্দিন জীবনে 'ঋণ' বলতে সাধারণত ধনসম্পদের গ্রহণ ও প্রত্যর্পণকেই বোঝানো হয়।[1] বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রে এই গ্রহণ ও প্রত্যর্পণের বিভিন্ন ধরনের বিধি ও নিষেধ নির্দিষ্ট আছে।

উত্তমর্ণ ও ঋণমর্ণ

নারদস্মৃতিতে বলা হয়েছে,

"ঋণম্ দেয়ম্ যদেদত্তম্ যেন যত্র যথা চ যৎ।
তথা প্রদাপ্ যদৈবং ঋণদানম্ ইতি স্মৃতম্।।"

অর্থাৎ ঋণদানের ক্ষেত্রে দেয়, যাদের, যেন, যত্র ও যথাকাল এই পাঁচটি নিয়ম নির্দিষ্ট হয়েছে।

নারদস্মৃতিতে ঋণদানের আলোচনা

দেয়—বিশেষ বিশেষ রীতি অনুযায়ী ঋণ দেওয়া হয়। অর্থাৎ কাকে ঋণ দেওয়া উচিত বা এই নিয়মে বলা হয়েছে।

যাদের—বিশেষ বিশেষ রীতি অনুযায়ী ঋণ দেওয়া নিষেধ আছে। স্ত্রী, বালক, দাস এরা যেখানে ঋণদাতার কোন লাভ নেই বরং ক্ষতিসম্ভাবনা তার আছে, সেখানে ঋণ দেওয়া নিষেধ আছে।

যেন—যে প্রকারে ঋণ দেওয়া হবে তা এই নিয়মে উল্লেখ করা হয়েছে।

যত্র—ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্থান ও কাল নির্দিষ্ট করার কথা এই নিয়মে পাওয়া যাচ্ছে।

যথাকাল—ঋণের প্রকার বা কি পরিমাণ ঋণ এই নিয়মে তা নির্দেশ করা হয়েছে।

---

* ঋণ শব্দটি ঋণ থেকে হয় ঋণ। কিন্তু 'ঋণদাতা' এই নিয়ম অনুযায়ী ঋণমর্ণ ঋণ থেকে 'ঋ' স্থানে 'ণ' হয়েছে।

1. "ধনসম্পদের উত্তম ও গৃহীতের" জনৈক।

উত্তমর্ণের ক্ষেত্রে ঋণদিবি ও ঋণদানবিধি—এই দুই প্রকার বিধির কথা বলা হয়েছে।[1] বাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে ঋণগ্রহণের ক্ষেত্রে সাক্ষী, বন্ধক প্রভৃতির কথাও লিখিত আছে। নিবন্ধস্মৃতিতে কোন ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য বিভিন্ন উপায় গ্রহণ বলা প্রয়োজনের নিয়ম আছে। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে ঋণদান-আলোচনা, সাক্ষীতে, ঋণ বা ঘটনার প্রমাণাদি বলা প্রয়োজনের ব্যবস্থা ঋণ পুনরুদ্ধারে শাস্ত্রবিধিরূপ।[2]

ঋণদিবি ও ঋণদানবিধি

দৈনিক ঋণের ব্যাপার কিছু ভিন্নতর। এই ঋণ ধন-সম্পদের আদান-প্রদানভিত্তিক নয়। এখানে 'ঋণ' শব্দের দ্বারা ব্যবহারক্ষেত্রে দৈনিক সময়ের মধ্যকার বিভিন্ন কাজের যোগাযোগ বোঝানো হয়েছে। এই ঋণ মূলত দৈনিক হলেও ঋণ-অনুযায়ী, আশ্রমধর্মোপযোগী এবং যোগের পূর্বসূত্র।

দৈনিক ঋণ-ব্যাপার ঋণ

ঋণসংক্রান্ত ঋণ-সংক্রান্ত আলোচনা বিশেষ দৃষ্টি হয় না; তবে কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়ারণ্যকের ঋণের উৎপত্তি ও বিকাশ পরিষ্কারই লক্ষিত হয়েছে। এই সংহিতায় বলা হয়েছে, "আমাদের যে ব্রাহ্মণ্যবিষয়ক আমাদের, দুষ্কৃতকর্ম অধিকারে যজ্ঞের দেবতার প্রভাব বিদ্যুতের এবং যা অন্যের যা পূর্বে বাস্তু দেবতাধীনাদী প্রজাপতিদেবতাদের ঋণসমন্বয়ানাম্।" (তৈত্তিরীয়সংহিতা- ৬ ৩।১০)। অর্থাৎ ঋণদান ব্রাহ্মণ তিন প্রকার ঋণ আছে। এই তিনপ্রকার ঋণ হল ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ। বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ এবং পুত্রের উৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হতে হয়। এই তিন প্রকার ঋণ হল ব্রাহ্মণদের তিন প্রকার দায়বদ্ধতা। এই ত্রিবিধ শাস্ত্রবদ্ধতা মনুসংহিতার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, নিছক শাস্ত্রীয় উপদেশ নয়। মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য এই ত্রিবিধ দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ত্রিবিধ ঋণ

বিষ্ণুধর্মোত্তরে বলা হয়েছে :

"দেবতাভ্যস্তথা ঋষ্যপিতৃভ্যশ্চ মানবঃ।
অনৃণিত্বং সমাপ্তিরূপসংহারইত্যুত।।
ব্রাহ্মণেন প্রজায়া চৈব পিতৃত্বম্ পূর্ণতা ভবেৎ।
ঋষীণাং ব্রহ্মচর্যেণ ক্রতুনেজ্যা ফলপ্রদা যথা।।"

---

1. উত্তমর্ণ যু ঋণদিবি ঋণদানবিধি ইতি বিশেষ। ঋণদর্শন।

2. "ঋণদি দায়ভাগেন ঋণের আলোচনা ঋ।
ঋণের ঋণদেবতা, ঋণদানে ঋণের ঋ।।" মনুস্মৃতি।

ঋষিঋণ

দেবঋণ

পিতৃঋণ

সমস্যাটির বীজ উৎপাদন করায়। এই দাবী পরবর্তী বৈদিক স্তর-গুলোয় 'ঋত' নামে পরিচিত।

বৈদিক ঋষি দেখে এই কয়টালি নিজে ও প্রকৃতিকে চিহ্নিত করেছেন। কথায় মূল হলো যে বাহি সমাজে প্রশংসিত হন। কথায় দেবতা দুটি যেমন সমাজে প্রশংসিত ছিল, কথায়ে কথায়ে তেমনি সমাজে চিহ্নিত ছিল। এই কারণে শত্রুবিহিত উপায়ে কথায় দেবতা মূল হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

আধুনিক ঋষি দেখে কথা চতুষ্টয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যথার্থ, পরাহত, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চতুষ্টয়ের মধ্যে পিতৃকথায় পাহাড়, দেবকথায় বানপ্রস্থ এবং অধিকথায় সন্ন্যাস আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে বৈদিক সমাজব্যবস্থার নীতি ও আচারগুলো প্রতিটি আশ্রমেই পর্যাপ্ত গুরুত্ব পেয়েছে। সমাজের প্রতি মানুষের সক্ষ অবদান দেবার পাহাড় জীবনই সমাজদেবার স্থল নয়। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস জীবনও সমাজদেবা থেকে আলাদাই ছিল না। কবিদের বলা হয়েছে পাহাড় জীবনের কথা পরিবেশন না করে কেউ যদি বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস জীবনের গ্রহণ করেন তাহলে ঐ কথা পরিবেশনের জন্য তাঁকে পুনরায় পাহাড় জীবনে ফিরে আসতে হয়।

আধ্যাত্মিক দিক থেকে কথা পুরুষার্থ সাধক। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের মধ্যে মোক্ষই পরমপুরুষার্থ। কিন্তু মোক্ষলাভের জন্য কথায়ুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ বিশেষ কথের জন্য বিশেষ বিশেষ কর্তব্যকর্ম নির্দিষ্ট আছে। কথানুষ্ঠিত উপায়কালে এই সকল কর্মকে বলা হয় কথানুষ্ঠেয়। কথানুষ্ঠেয় কর্মগুলি সম্পাদনের মাধ্যমে মোক্ষ বা পরমপুরুষার্থ লাভ করে পারে। কথানুষ্ঠেয় কর্মসমূহের একদিকে যেমন বৈদিক এবং সামাজিক গুরুত্ব ছিল অন্যদিকে, তেমনি কথাগুলিকে পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্বও ছিল অপরিসীম।

কাজ

কাজ (যজ্ঞ + ঘ) আধ্যাত্মিকতার প্রধান বৈদিক অনুষ্ঠান। দেবতার উদ্দেশ্যে যেসব দ্রব্য দান করার নাম যজ্ঞ। দেবতাদের প্রধানতঃ দুজন ভাগে ভাগ করা যায়। যাঁরা দেবতাদের জন্য কথিতা সম্পাদন করেন। যাজ্ঞে যেসব দ্রব্য ত্যাগ করার নাম আহুতি। যে জন্য ত্যাগ করা হয় তার নাম হবা। যার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় যজ্ঞমান। যিনি যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করেন তাঁকে বলা হয় যাজক বা ঋত্বিক। একাধারে যাজনকারী যাজক বা ঋত্বিক হতে পারেন।

বৈদিক সমাজে আনুষ্ঠানিক দিকটি ছিল যথেষ্টাধিক। এইজন্য বৈদিক ধর্মকে যজ্ঞধর্ম বলা হয়। বৈদিক যুগে পুজা অর্চনার প্রচলন ছিল না। সেজন্য ছিল প্রধান অনুষ্ঠান। পরনে বস্ত্র, মুখে কথা, সম্পদ বা সমৃদ্ধিলাভে, আরোগ্যলাভে বা অপরাপরি যে কোন কারণের জন্যই দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হত। সাধারণতঃ অগ্নিদেবই আহুতি দেওয়া হত। আহুতিকে দেওয়া হয় পরার্থ অগ্নিদেব কথা দেবতাদের নিকট পৌঁছে দেবে যায়, এরূপ ধারণা ছিল। দুধকাজ, পিতৃযজ্ঞ ও পার্বণের মাজে এই ধরণের আহুতিকে লক্ষ্য করা যায়।

বৈদিক যাগযজ্ঞের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

(১) অনুষ্ঠান : কয়েক কথা দেবতাকে তাকুন।

(২) যজ্ঞমানের অগ্নিতে পূর্বে যাজনকর্ম পাই।

(৩) দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদানের প্রধান।

(৪) যজ্ঞমান ও অধিকারের কথা প্রধানতার অংশিদ্বি অংশ গ্রহণ।

বৈদিক যুগে এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে কথা যজ্ঞমানের দেহে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হয়। যাজক ও ঋত্বিক যজ্ঞমানের অক্ষিণ কাজ করেন। যাজ্ঞের তিনটি প্রধান অঙ্গ হল দেবতা, হবা বা নৈবেদ্য ও অধিক।

যজ্ঞের বৈশিষ্ট্য

দেবতা

দেবতার কথাগুলি যথেষ্টভাবে দুই শ্রেণীর—স্তুতি ও প্রার্থনা। প্রত্যেক দেবতাদেরই দেবতা আছে। বৈদিক অধিকাংশ মন্ত্রগুলির মধ্যে কয়ে নৈসর্গিক শক্তিকে তাদের ও তাদের মানবকল্যাণ কার্যকলাপ। নামরূপ সম্বন্ধিত হয়ে এই সব শক্তিই হয়েছেন দেবতা দেবতা। অধিকাংশ শক্তিই পুরুষদেবতা, স্ত্রীদেবতার মূল দেবী। উষস, সরস্বতী, পৃথিবী ও রাত্রি হল স্ত্রী দেবতা। কথাগুলো দেবতাদের কথা প্রার্থনা ও কবিদের স্তোত্র কথা হয়েছে। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ স্তোত্রাদের। এই স্তোত্রকারদের দেবতাদের ত্রিবিভাগীয়তে বিভক্ত। অগ্নি, বায়ু কথাল ইত্র এবং পৃথিবী কথাদের এই মূল ত্রয়ীর প্রধান দেবতা। পরে প্রত্যেক স্থানে এদের [illegible] কথে দেবতা, যাঁরা মেটা মেটি তেত্রিশ দেবতার কথায় গণ্য হয়েছে। অগ্নি, সোম, অন্তঃ পৃথিবীর দেবতা, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎ, বায়ু, পর্জন্য প্রভৃতি অন্তরীক্ষের দেবতা। মিত্র, বরুণ, সূর্য, অদিত্য প্রভৃতিকে বলা হয় স্বর্গের দেবতা। অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এই ত্রিদেবতা মুখ্য দেবতার মধ্যে অগ্নি আমাদের কাছেপেক্ষা নিকটবর্তী এবং সূর্য সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী।

হব্য বা নৈবেদ্য

বিভিন্ন যজ্ঞ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার হব্যদ্রব্যের প্রচলন আছে। যবের বা চালের পিষ্টক, ধান্য, ভাজা যব, করম্ভ বা দধি মিশ্রিত যবের ছাতু, পরিবাপ বা ঘৃতপক্ক খই, চরু বা ঘৃতপক্ক চাল, আর্য বা ঘৃত, ব্যাজন বা ঘোল, ঘর্ম বা উষ্ণ দুগ্ধ, আমিক্ষা বা দধি মিশ্রিত দুগ্ধ, বপা বা পশুমেদ, সোমরস, সুরা প্রভৃতি সাধারণভাবে যজ্ঞের হব্যদ্রব্য রূপে ব্যবহৃত হয়।

হব্য

ঋত্বিক

যজমান অর্থাৎ যাঁরা কোন কিছু কামনা করে যজ্ঞ করেন, যজ্ঞের রীতিনীতি সম্পর্কে তাঁদের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকে না। এই কারণেই ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। বেদে নানা ধরনের ঋত্বিকের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা। ঋগ্‌বেদীয় ঋত্বিকের নাম হোতা। সামবেদীয় ঋত্বিকের নাম উদ্‌গাতা, যজুর্বেদীয় ঋত্বিকের নাম অধ্বর্যু এবং ঋক, সাম, যজুঃ এই ত্রিবেদীয় ঋত্বিকের নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ঋত্বিক। যজ্ঞকর্মে কোনরূপ ত্রুটির জন্য ঋত্বিকই দায়ী। কারণ তিনিই সমগ্র যজ্ঞ কর্মটি পরিচালনা করেন। বেদে মোট ষোলো জন ঋত্বিকের পরিচয় পাওয়া যায়। মতান্তরে যজমানকেও অন্যতম ঋত্বিক বলে গণ্য করা হয়েছে। এই মতে যজমান যেহেতু ঋত্বিকের সাথে মন্ত্রপাঠ করেন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান করেন সেইজন্যে তিনিও অন্যতম ঋত্বিক। যজমানকে ধরে তাই ঋত্বিকের সংখ্যা দাঁড়ায় সপ্তদশ। প্রতিটি যজ্ঞেই একজন প্রধান ঋত্বিকের সঙ্গে একাধিক সহকারী ঋত্বিক থাকতে পারেন। ঋগ্‌বেদীয় ঋত্বিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে, সামবেদীয় ঋত্বিক গানের মাধ্যমে এবং যজুর্বেদীয় ঋত্বিক যজ্ঞানুষ্ঠান কর্মের মাধ্যমে দেবতাকে আহ্বান করেন। ত্রিবেদজ্ঞ ব্রহ্মা অন্যান্য ঋত্বিকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করেন এবং সার্বিকভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

ঋত্বিক

ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন ব্যক্তির ঋত্বিক পদের অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে ঋত্বিক নিয়োগে বারণ ছিল। ব্রাহ্মণেরা নিজেরাই ঋত্বিকের কাজ করতেন। ঋত্বিক যজমান ও দেবতার মধ্যবর্তী হয়ে যজমানের আহুতি যাতে দেবতার নিকট পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করতেন। এর জন্য ঋত্বিককে দক্ষিণা দিতে হত। হিরণ্য, গো, অশ্ব, বস্ত্র প্রভৃতি দক্ষিণা রূপে ঋত্বিককে দেওয়া হত। যজ্ঞ অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যক ঋত্বিক নিযুক্ত হত। সোমযোগে ষোলো জন ঋত্বিকেরই প্রয়োজন।

যজ্ঞের অন্যতম অঙ্গ হল বেদি নির্মাণ। যজ্ঞীয় দ্রব্যকে রাখতে হয় বেদির উপর। যজ্ঞে তিন প্রকার অগ্নির ব্যবহার পাওয়া যায়। এই তিন প্রকার অগ্নি হ'ল গার্হপত্য,

আহবনীয় ও **দক্ষিণাগ্নি**। গার্হপত্য অগ্নি সর্বদা প্রজ্বলিত রাখতে হয়। গার্হপত্য অগ্নি থেকে আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নিকে জ্বালাতে হয়। অগ্নিশালায় এই তিন প্রকার অগ্নিস্থাপনের নাম **অগ্ন্যাধান**। আহবনীয় অগ্নিতে অগ্নিহোত্র হোম করা হয়। বৈদিক যুগে অরণিঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলনের ব্যবস্থা ছিল। এর নাম **অগ্নিমন্থন**। আহবনীয় কুণ্ডে কাষ্ঠ স্থাপনকে বলা হয় **অগ্নিসমিন্ধন**।

বেদি নির্মাণ যজ্ঞের অন্যতম অঙ্গ

নানা দিক থেকে যজ্ঞের নানা প্রকারভেদ করা হয়েছে। গার্হস্থ্যাদি আশ্রমভেদে যেমন যজ্ঞের ভেদ করা হয়েছে, তেমনি আবার প্রধান যজ্ঞ, অঙ্গযজ্ঞ প্রভৃতি ভেদেও নানা প্রকার যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রধান যজ্ঞ পঞ্চপ্রকার। এই পঞ্চপ্রকার যজ্ঞ হল—**হোম, ইষ্টি, পশু, সোম** ও **সত্র**। এছাড়াও নানারূপ অঙ্গযজ্ঞ (বিকৃতিযাগ) আছে। কোন কোন শাস্ত্রে ইষ্টি, পশু ও সোম—এই ত্রিবিধ যজ্ঞকেই প্রধান যজ্ঞ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যাই হোক্, বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে সোমযজ্ঞই সর্বপ্রধান। সোম একপ্রকার লতা, এই লতার রস আহুতি দিয়ে সোমযজ্ঞ করা হয়। **অশ্বমেধ** ও **রাজসূয়** যজ্ঞ সোমযজ্ঞের দুটি প্রকার। পশুযজ্ঞ পশুকে আহুতি দেওয়া হয়। সাধারণত ছাগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েই এই আহুতি দেওয়া হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ইষ্টিযজ্ঞ করা হয়। দুগ্ধ, দধি, পুরডাশ প্রভৃতি এই যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। ধান্য অথবা যবের দ্বারা পুরডাশ তৈরি করা হয়। দর্শপূর্ণমাস হ'ল ইষ্টিযজ্ঞের প্রধান যজ্ঞ। বহুপ্রকারের ইষ্টিযজ্ঞ আছে। তার মধ্যে পুত্রলাভের জন্য করা হয় **পুত্রেষ্টি** যজ্ঞ।

যজ্ঞের বিভাগ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ভগবদ্‌গীতা বা সংক্ষেপে "গীতা কথাটির মানে ঈশ্বরের স্তবগান।"[১] উপনিষদ এর উৎস। গীতা উপনিষদের সার। উপনিষদ যেন গাভী এবং গীতা সেই গাভী নিঃসৃত দুধ, যা দোহন করছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং যা পান করছেন শ্রীমান অর্জুন।

মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অংশ বিশেষ গীতা মহাভারতের মতই প্রাচীন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল খ্রিঃ পূঃ দশম শতাব্দী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে কৌরব পক্ষে আচার্য, গুরুজন ও অসংখ্য আত্মীয়বর্গকে উপস্থিত দেখে পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ অর্জুন বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। অর্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যুদ্ধ করা বা না করা—কোন্‌টি

তাঁর কর্তব্য তা ঠিক করতে না পেরে অর্জুন বিষাদাচ্ছন্ন। তখন অর্জুনের সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কৌরব পাণ্ডবের ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য যে উপদেশাবলী দেন, তাই 'ভগবদ্‌গীতা' নামে খ্যাত।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন—'তুমি স্বরূপত সেই আত্মা। দেহাদি হতে ভিন্ন আত্মা নিত্য, অবিনাশী, দেহের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না। তুমি নিজ আত্মস্বরূপ ভুলে শোকগ্রস্ত হচ্ছ।' শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে বলেন—

"ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয়ি উপপদ্যতে"

—(ভগবদ্‌গীতা-২।৩)।

'হে অর্জুন, ক্লীবভাব আশ্রয় করিও না। তোমার এই ক্লীবতা সাজে না। তুমি এই দুর্বলতা পরিত্যাগ করে যুদ্ধার্থে উত্থিত হও।'

গীতার বক্তা "স্বয়ং জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর শ্রোতা শ্রীমান অর্জুন। লক্ষ্য অর্জুনের দুঃখমুক্তি। অর্জুনের দুঃখ ও দুঃখমুক্তি সর্বকালে সকল মানুষের দুঃখমুক্তি।"[১০]

আঠারটি অধ্যায়ে বিভক্ত ভগবদ্‌গীতা ধর্ম ও দর্শনের এক অসাধারণ গ্রন্থ। গীতার আঠারটি অধ্যায় হল : (১) অর্জুনবিষাদযোগ ; (২) সাংখ্যযোগ ; (৩) কর্মযোগ ; (৪) জ্ঞানযোগ ; (৫) সন্ন্যাসযোগ ; (৬) ধ্যানযোগ বা অভ্যাসযোগ ; (৭) জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ; (৮) অক্ষরব্রহ্মযোগ ; (৯) রাজযোগ বা রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ ; (১০) বিভূতিযোগ ; (১১) বিশ্বরূপদর্শনযোগ ; (১২) ভক্তিযোগ ; (১৩) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ ; (১৪) গুণত্রয়বিভাগযোগ ; (১৫) পুরুষোত্তমযোগ ; (১৬) দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ ; (১৭) শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ ; (১৮) মোক্ষযোগ।

প্রচলিত গীতার শ্লোকসংখ্যা ৭০০। এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কথিত শ্লোক ৫৭৫, অর্জুন কথিত শ্লোক ৮৪, সঞ্জয়কথিত শ্লোক ৪০ এবং ধৃতরাষ্ট্র কথিত শ্লোক ১। "শঙ্করাচার্য হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি সকল ভাষ্যকার, টীকাকার ও ব্যাখ্যাকারই গীতার উক্ত শ্লোকসংখ্যা নির্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছেন।"[১১]

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা অবলম্বনে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গীতার ভাষ্য ও টীকাদির সংখ্যা বহু। গীতার ভাষ্যকার ও টীকাকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শঙ্করাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্কাচার্য, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য, শ্রীচৈতন্য অনুগামী শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি। শ্রীমধুসূদন

সরস্বতী, শ্রীশঙ্করাচার্য, মহর্ষি কণাদ, যোগিবর শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী, স্বামী অভেদানন্দের নীতি আমার সম্বন্ধে। নীতির দাস্য আমাদেরকে মধ্যে শঙ্করাচার্যের আমাদের প্রতিনিয়ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আত্মজ্ঞানলাভের বা মুক্তি লাভের উপায় রূপে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ আলোচিত হয়েছে।

"আমাই নীতির বাণী। সকল কর্মের অনাসক্তভাবেই নীতির বাণী। 'আপনাদিগের অভ্যন্তরমানস'—এখানে আপনার দ্বারা আমাদের অন্তরস্থ সাত্ত্বিকতিত্তিকে—উপনিষদের এই মহতী সংজ্ঞা নীতির বিশুদ্ধভাবে আছে।"[১২]

বাস্তবিকপক্ষে বিনা এবং কোন কোন মনীষীর মতে, ভগবদ্গীতায় প্রধান শিক্ষা কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্মের তত্ত্ব। কর্ম না করে কেউ জগতেও থাকতে পারে না। সকলেই সাধু হবার ও ভাল হবার প্রয়াসে কর্ম করতে বাধ্য হয়। কর্ম করবেই হবে। এদের প্রয়োজন আছে। কর্মহীন হয়ে কেহবাচ্যও নিশ্চিহ্ন হবে না। হবে কর্ম করতে হবে নিষ্কামভাবে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বারবার বলেছেন—কর্ম ভিন্ন লাভের উপায় নয়, কর্মই ধর্ম। কর্মবাদীদের কর্ম করতে হবে। কর্ম করার আগে বা কর্ম করার সময় কর্মফলের কথা চিন্তা করলে চলবে না। আমাদের মধ্যে 'কর্ম' শব্দ 'যা করা হয়' ('what is done') বা 'একটি কাজ'কে ('a deed') বোঝায়। আবার 'কর্ম' শব্দ দ্বারা নৈতিক কর্মবিধান নিয়তি, কর্ম ও ফলাদি কর্মফলও বোঝায়। বিচার এসে, কর্ম বলতে কোন ধরনটি বুঝতে হবে। গীতায় বলা হয়েছে—কোন কর্মত্যাগ করতে পারে না এবং কর্মত্যাগ করলেই সিদ্ধি লাভ হয় না। আমাদের কর্ম করতেই হবে। তবে যেভাবে কর্ম করলে কর্ম বন্ধনকারক হয়, সেভাবে নয়, মুক্তি কামনা হবে। এর জন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের দ্বারা সংযত করে, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে হবে।

তাই ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২/৪৭) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন।

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।।"

অর্থাৎ "কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। অতএব কর্ম কর। কিন্তু ফলের 'আকাঙ্ক্ষাই' যেন তোমার কর্মের হেতু না হয়। আবার কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।"

তাই ভগবদ্গীতায় সকল সৃষ্টির কর্ম সম্পাদনের উপাদান দেওয়া হয়েছে। কর্মফলের সুখকর দিকি ও দুঃখকর দিকটি, লাভ-ক্ষতি, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে সমভাবাপন্ন অবস্থান করে অন্যের না নিরীক্ষার চিত্তে কর্মসম্পাদনকেই যোগ ("সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো

১২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬।

ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে"—ভগবদ্গীতা, ২/৪৮)। কর্মযোগে আসক্তি বর্জন করে, সমত্ববুদ্ধি যুক্ত হয়ে কর্ম করার কৌশলটি যোগ ("যোগঃ কর্মসু কৌশলম্—ভগবদ্গীতা, ২/৫০)। শ্রীমদ্ভূদন সরস্বতী তাঁর গীতার গূঢ়ার্থদীপিকা নামক টীকায় বলেছেন : "কর্ম করিতে হইবে। কর্মত্যাগ করিয়া কখনও জ্ঞাননিষ্ঠ যোগারূঢ়রূপে স্থিতি প্রাপ্ত হইতে পার। যাবৎ জগতের জন্য কর্ম করিবার অধিকার হইবে না। তাই কর্ম করিতে হইবে, কিন্তু অনাসক্তভাবে ত্যাগপূর্বক ; সাত্ত্বিক বুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত হইলে নিষ্কাম কর্ম অনায়াসে সম্পাদিত হয়।"[১৩]

কর্মযোগের ব্যাখ্যায় ভগবদ্গীতায় কর্মত্যাগের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে কর্মফলত্যাগের কথা, কর্মাসক্তি অনাসক্তির কথা। কর্মবিনা সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে কৃত কর্মটি নিষ্কাম কর্ম বা কর্মযোগ। কিন্তু তা নিশ্চিত সম্ভব। তা তখনই সম্ভব হবে যখন কর্তা নিযুক্ত ব্যক্তির 'আমি কর্তা' এই ভাব না থাকে। এই কর্তৃত্বভাব পূর্ণ হতে হবে সাত্ত্বিকের যোগস্থ হয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরাপিত কর্ম করতে হবে। অর্থাৎ কর্মযোগী কর্মকে মনে করেন ("যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়"—ভগবদ্গীতা, ২/৪৮)। ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকে, কর্তৃত্বাভিমান ও অহঙ্কার পূর্ণ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছিত জন্য, জীবের কল্যাণের জন্য কৃত কর্মটি যজ্ঞ। যজ্ঞের মধ্যে ত্যাগের মনোভাব মিহিত। যজ্ঞময় সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনিষ্ট বা অনাকাঙ্ক্ষিত ত্যাগ করতে হয়। এভাবে যজ্ঞবুদ্ধিতে কৃত কর্মটি নিষ্কাম কর্ম। কর্মটা যখন যজ্ঞময় পরে পরিণত করা হয়, তখন কর্মটি ব্রহ্মকর্মী হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছিত জন্য করলে সব কর্ম যজ্ঞে পরিণত হয়। ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে (৩/১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন।

"যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।"

অর্থাৎ ঈশ্বর প্রীত্যর্থ জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম ব্যতীত কর্ম লোকের বন্ধন হয়। অতএব তুমি ভগবানের উদ্দেশ্যে অনাসক্ত হইয়া কর্তব্যবোধে কর্ম কর।" ভগবদ্গীতা কর্মপরিত্যাগ বা কর্মসন্ন্যাসের কথা বলে না, কিন্তু অনাসক্তভাবে কর্ম করতে বলে। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন : "অতএব তাহা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। আমাতে মনঃ ও বুদ্ধি অর্পণ কর।" ("তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ"—ভগবদ্গীতা, ৮/৭)। তিনি সমস্ত বুদ্ধিবল যোগের দ্বারা সব কর্ম ভগবানে সমর্পণ করতেন, তিনি আমাদের দ্বারা সব সময়ে উপদেশ করেছেন এবং তিনি আত্মবলম্বন তাঁর থেকে কর্ম

১৩. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভূদন সরস্বতী প্রণীত টীকার বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, শ্রীভূবনমোহন সাঙ্খ্যতীর্থ, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ২৮২-২৮৬।

সম্ভবপর হয় না; অন্তরের পূর্ণ প্রসন্নতা দ্বারা চিত্তমধ্যে কর্ম অনাহত হয়ে। ভাগবতীয় তৃতীয় অধ্যায়ে (৩/৩২) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—অধ্যাত্মযোগে ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করে তৃষ্ণারহিত কামনে সহিষ্ণু অন্তরে হবে। কাম নামের জন্য যেমনি হবে পূর্ণ আত্মাকে অন্যে করতে হবে। আত্মজ্ঞানই তৃষ্ণারহিত কামনে তিনটি পথে। ভাগবতীয় (৪/২১) বলা হয়েছে :

"আত্মনে মনসা পূর্ণা কেবলেন ইন্দ্রিয়েন চ।
যোগিনো কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গমাত্মা আত্মশুদ্ধয়ে।।"

অর্থাৎ, নিষ্কাম কর্মযোগিগণ কামনাহীন সর্বান্তঃকরণ মনইন্দ্রিয় শুদ্ধ ('আত্মনে' এইস্থানে প্রবিষ্ট) হইয়া কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা নিরন্তরিত জন্য কর্ম করেন / আত্মশুদ্ধি বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য নিরন্তরি প্রয়োজন। জ্ঞানযোগ বাসনার ঘাত কর্মযোগ চিত্তে আত্মশুদ্ধি প্রকাশিত হয় না।

নিষ্কাম কর্ম মুক্তিলাভে সহায়ক হয়। এই ভাগবতীয়ার তৃতীয় অধ্যায়ে (৩/১৯) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন :

"তস্মাদ্ অসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হি আচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।"

অর্থাৎ 'অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্তব্য (নিত্য) কর্মের অনুষ্ঠান কর। আসক্তশূন্য হইয়া কর্ম করিলে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবে।'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভগবদ্গীতায় আত্মসাক্ষাৎকার বা মুক্তি লাভের উপায় রূপে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্গীতার কোন কোন ব্যাখ্যাকার কর্মযোগকে, কেউ কেউ জ্ঞানযোগকে, আবার অনেক ভক্তিবাদীকে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলে দিয়েছেন। কিন্তু অনেকের মতে, ভগবদ্গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্গীতায় কখনও কর্মযোগের, কখনও জ্ঞানযোগের, আবার কখনও ভক্তিযোগের প্রশংসা করা হয়েছে। ভগবদ্গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে কর্মযোগের প্রশংসা করে বলা হয়েছে—কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ই মুক্তিলাভে হলেও কর্মসন্ন্যাস (জ্ঞানযোগ) অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান উৎকৃষ্টতর ("তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে")। ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ১৮-১৯শ শ্লোকে জ্ঞানের প্রশংসা করে বলা হয়েছে—তিনি তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী, যাঁর জ্ঞান-অগ্নি সকল কর্মকে ভস্মীভূত করেছে, তিনি পণ্ডিতগণের অগ্রণী ("জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ"—৪/১৯)। আবার ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪৭শ শ্লোকে ভক্তির প্রশংসা করে বলা হয়েছে—"তিনি আমার অনন্য ভক্ত, তিনি সেই

সকল ইন্দ্রিয়ের সাধক করে আমাতে চিত্ত সমাহিত পূর্বক আরাধনা করেন" ("শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ")।

এথেকে দেখা যায় যে, ভগবদ্গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়ের আদর্শ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৫শ শ্লোকে বলা হয়েছে :

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।"

অর্থাৎ, "ভক্তি সাধনের দ্বারাই সাধক পরমাত্মাকে জানেন এবং জ্ঞানের দ্বারা অধিকারী হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভক্তির পর জ্ঞানের উদয় হয়।"

অনাসক্ত হয়ে নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম করলে ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় ও পরে নির্মিল কর্ম দ্বারা পরাগতির হয়। নিষ্কাম কর্ম করতে হলেই জ্ঞানী হতে হবে। জ্ঞানী হলে ভক্ত হতে হবে। ভক্ত হয়ে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে কর্ম করতে হবে। গীতার সেইটুকু সোপান যা জ্ঞানীদের লক্ষ হয়ে সেখে কর্মীই জ্ঞানী হন।

জ্ঞানী 'সমাধিস্থতে বাসুদেব আত্মেরা' ("বাসুদেবঃ সর্বম্") এই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা হন ব্রহ্মভূত। কর্মের শেষ তাত্ত্ব নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি। জ্ঞানের শেষ তাত্ত্ব ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়া (ব্রহ্মভূত)। তখন ব্যক্তি দ্বারা সৃষ্টি লয় একীভূত হয়। ব্রহ্মভূত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে পরাভক্তি লাভ করেন ("মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"—ভগবদ্গীতা ১৮/৫৪)।[১৮]

অনেকের মতে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের মধ্যে সমন্বয়ের অপূর্ব রূপদান করেও ভক্তিযোগেরই প্রাধান্য স্থাপন করেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যবর্তী গীতার পুরাণবিশিষ্টা নামক টীকায় গীতাকে তিনটি ষটকে ভাগ করে (প্রথম ছটি অধ্যায় কর্মযোগ, সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তিযোগ এবং শেষ ছটি অধ্যায়—ত্রয়োদশ থেকে আঠারোশ অধ্যায় পর্যন্ত জ্ঞানযোগ) ভক্তি প্রাধান্য দেখিয়েছেন।

"উপরমপুরা সা হি সর্বশাস্ত্রপ্রয়োজনী।
সর্বশিক্ষা চ গুহ্যা চ জ্ঞানবিজ্ঞানতা সা হিতা।।"

---

১৮ গীতা-বোধ, উ. মহাদেবানন্দ গঙ্গোত্রী, পৃ. ৪৪১।

আচার্য মধুসূদন সরস্বতিযোগকে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের মাঝখানে রেখেছেন এ কারণে যে, ভক্তি উৎসারেই (শব্দ এবং অর্থে) অনুপম। ভক্তির সঙ্গে কর্ম ও জ্ঞানের বিরোধ নাই। তাই ভক্তির তিনটি রূপ : কর্মভিত্তিক ভক্তি, জ্ঞানভিত্তিক ভক্তি এবং শুদ্ধা ভক্তি।[১৮]

গীতার শেষ কথা—প্রপত্তি বা শরণাগতি। গীতার অষ্টাদশ, মতে ও সাতে এই শরণাগতির কথাই বলা হয়েছে। গীতার প্রায়শ্চিত্ত আমরা এই শরণাগতির[১৯] কথা পাই। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন যখন তাঁর স্বধর্মের অর্থহীন নিষ্ফলতা বিলাপ করতে পারলেন না তখন তাঁর শক্তিহীনতায় উপলব্ধি হয়। তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেন—

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" (ভগবদ্গীতা, ২/৭)।

অর্থাৎ 'আমি শিষ্য, তুমি গুরু, আমাকে শাসন কর, শিক্ষা দাও, উপদেশ দাও। আমি তোমার শরণাগত'। এই শরণাগতির ফলে আমরা অর্জুনের আর্তি, ভক্তি। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দেন।

আমরা গীতার নবম অধ্যায়ে আমরা শরণাগতির কথা পাই। শ্রীভগবানের শরণাগত হলেই কল্যাণ। শ্রীকৃষ্ণকেই 'প্রাপ্তির গন্তব্যরূপে ও পরিণামে। ভগবানই সকলের আত্মা, সকলেরই শরণ, ও কল্যাণকারী' ("পরিভাষা) তাঁকে সর্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ"—(ভগবদ্গীতা, ৯/২৭)।

গীতার নবম অধ্যায়ে (৯/২৭) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন :

"যৎ করোষি যদ্ অশ্নাসি যজ্ জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্।"

অর্থাৎ 'হে কৌন্তেয়, যে কোন কর্ম, আহার, হোম, দান, তপস্যা, যাহাই কর না কেন, তাহা আমাকে অর্পণ করিয়ো এরূপ বুদ্ধিতে কর।' এই শ্লোকে বলা হয়েছে—শ্রীভগবানের শরণাগতি এবং সমস্ত কর্মের ফল তাঁর চরণে সমর্পণ—এটিই গীতার শেষ কথা।

গীতার শেষে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—সকল প্রাণীদের অন্তঃকরণে যিনি বাস করেন সেই ঈশ্বরের শরণাগত হলেই পরমার্থ লাভ হয়। তাই ভগবদ্গীতায় (১৮/৬২) বলা হয়েছে :

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।"

১৮ "উপনিষদে ভক্তিবাদ", দেবীপ্রসাদগুপ্ত মুখোপাধ্যায়, উদ্ধোধন (১৩৭১ শতবর্ষী জয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা, ২০০০, পৃ: ১৯৮-১৯৯।

১৯ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মধু, খাষী ভগবদ্ধ্যানন্দ, ভগবদ্গীতা, ভারতীভগবদ্গীতা, পৃ: ৪২।

অর্থাৎ 'হে ভারত, তুমি সর্বান্তঃকরণে তাঁরই শরণ লও। তাঁর অনুগ্রহে পরম শান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।' সর্বান্তঃকরণে ভগবানেরই শরণাগত হতে হবে। ভিক্ষা, বাসনা ও কর্মের দ্বারা সর্বান্তঃকরণে তাঁরই শরণাগত হতে হবে। ভগবানের কাছে এই সর্বাত্মীকরণে আত্মসমর্পণই প্রথম পাওয়া যাবে। এই শরণাগতির কথাই বলা হয়েছে ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) এই শ্লোকে :

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

এই শ্লোকে বলা হয়েছে : 'হে অর্জুন, তুমি সকল ধর্ম (কর্তব্য) ত্যাগ করিয়া আমাকে শরণ লও। আমিই তুমি সর্বান্তঃকরণে আমাকে লাভ করবে। আমার স্বরূপ হও। আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি যা কিছু কর, সবই আমার উদ্দিষ্ট জন্য কর। আত্মসমর্পণ করে তুমি আমাকে পাবে আমা আশ্বাস দিচ্ছি।'

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) বলা হয়েছে :

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

অর্থাৎ 'সর্বধর্ম ('ধর্মের, আশ্রম ধর্ম ও সাধনা ধর্ম প্রভৃতি সকল প্রকার ধর্ম') পরিত্যাগ করে তুমি কেবলই শরণাগত হও। আমার শরণাপন্ন শরণাগতি দ্বারা তার সব কিছুই পরিত্যাগ কর। সর্বধর্ম ত্যাগের ফলে কর্তব্য অকর্তব্য জনিত পাপ তোমার হবে না। তুমি আমাতেই বিশ্বাস রাখ, আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সকল পাপ হতে মুক্তি দেব। শোক করিও না।

৯. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর শিক্ষা-ধ্যান গ্রন্থে বলেছেন : "অন্যান্য ভক্তি দ্বারা আমাদের (ভগবানকে) আত্মনিবেদনের জীবন সমর্পণ হইবেই গাঢ়নিষ্ঠা—রাজদ্বারাঘাত। সকল বিপদ বাধা হইল ভক্তি, আর সকল প্রতিবন্ধক ভক্তদের নিকট সংকেত হইল 'প্রভু, আমি তোমার হইলাম বলিয়া পরলোকে আত্মসমর্পণ।' আত্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি ও পরোক্ষানুভূতি আনন্দ স্বরূপের অনুভূতি লাভে অন্যান্য ভক্তিই সর্বাধিক শক্তিশালী উপায়। এই অনন্য ভক্তির মহাস্রোতে ভগবদ্গীতা কর্ম-জ্ঞানযোগের সমন্বয় ও ব্যবহারিক পারমার্থিক জীবনের সমন্বয়ও সুন্দর করিয়ে সমর্থ হইয়াছে।"[১৭]

ঈশ্বরে মন সমাহিত করলে, ঈশ্বরেই বুদ্ধি নিবিষ্ট করলে সেহেতু ঈশ্বরবাসে স্থিতি লাভ হয়ে তাতে সন্দেহ নাই (ভগবদ্গীতা ১২/৮)। এরূপ হওয়া যে ঈশ্বরে স্থিতি—এই উক্তির সমর্থনে অনিলদা হওয়া যায় মুণ্ডকের শ্রুতি (ভগবদ্গীতা ৮/৪)। আবার ইহ জীবনেই ব্রহ্মনির্বাণ যা মুক্তিলাভ হয় এরূপ উক্তির ভগবদ্গীতায় পাওয়া যায়

১৭. গীতা-ধ্যান (সমগ্র), ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, পৃ: ১১৬।

(৫/২৫)। গীতার "মূল লক্ষ্য জীবকে জীবন্মুক্ত অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া। স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থাই সেই জীবন্মুক্ত অবস্থা।"

ভগবদ্‌গীতা অনুযায়ী মুক্তির অবস্থাতেও মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষ কর্ম থেকে বিরত হন না, যদিও তিনি সকাম কর্ম করেন না যা তাঁর অভ্যন্তরীণ শান্তির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তখন তিনি অনাসক্ত হয়ে লোকসংগ্রহের জন্য অর্থাৎ মানুষকে অসৎ পথ হতে নিবৃত্ত করা এবং সৎপথে বা স্বধর্মে প্রবৃত্ত করার জন্য কর্ম করেন। ভগবদ্‌গীতায় এরূপ যোগীকে 'যোগারূঢ়' বলা হয়েছে। রাজর্ষি জনক, অশ্বপতি, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এভাবে সন্ন্যাসের ধারণা সকল প্রকার নিষ্ক্রিয়তা বিযুক্ত ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাই বলা যায়, নিবৃত্তির এই রূপান্তরিত আদর্শের ধারণা হিন্দু চিন্তায় ভগবদ্‌গীতার এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান।